



কডিএস সূচক্রে আলোক বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা

লেখক: অধ্যাপক ড. কাজী আ. মান্নান | প্রকাশিত: 15 August 2026, 02:42 AM | বিভাগ: ফচার



বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার মান, সক্ষমতা ও আন্তর্জাতিক অবস্থান নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনায় আমরা ইতোমধ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সূচক্রে দিকে দৃষ্টি দিয়েছি। শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত আমাদের দেখিয়েছে একটি বিশ্ববিদ্যালয় তার শিক্ষার্থীদের জন্য কতটা পর্যাপ্ত একাডেমিক সহায়তা নিশ্চিত করতে পারছে; একাডেমিক খ্যাতি দেখিয়েছে বৈশ্বিক একাডেমিক সমাজে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান, গবেষণা ও শিক্ষার গ্রহণযোগ্যতা কতটা প্রতিষ্ঠিত; আর এখন আন্তর্জাতিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত আমাদের সামনে উচ্চশিক্ষার আরেকটি মৌলিক প্রশ্ন হাজির করছে-বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আসলে কতটা আন্তর্জাতিক?

এই প্রশ্নটিকে কেবল বৈদেশিক শিক্ষার্থী বা বৈদেশিক শিক্ষক সংখ্যার হিসাব নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশ্বিক আকর্ষণ, আন্তর্জাতিক একাডেমিক পরিবেশ, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, জ্ঞান বিনিময়, গবেষণা সহযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক সুনাম। অতএব, কডিএস-এর আন্তর্জাতিক

শিক্ষক অনুপাত এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী অনুপাতকে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য নছিক
র্যাংকিং বা অবস্থান নির্ধারণের সূচক হিসেবে দেখলে এর প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব হবে না।
বরং এগুলোকে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আন্তর্জাতিকীকরণ বা বিশ্বায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ
জানালা হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

কডিএস-এর বর্তমান বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয় র্যাংকিং পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক শিক্ষক অনুপাত বলতে
একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষকের মধ্যে আন্তর্জাতিক শিক্ষকের অনুপাতকে বোঝানো হয়।
কডিএস-এর ভাষ্যে, বাদিশি শিক্ষকদের আকর্ষণ করতে সক্ষম হওয়া একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিবাচক
আন্তর্জাতিক সুনাম এবং স্থানে কাজ করার অনুকূল পরিশেষে ইঙ্গিত দিতে পারে। একই সঙ্কে বাদিশি
শিক্ষকরা তাঁদের নিজস্ব আন্তর্জাতিক গবেষণা-সংযোগ নিয়ে আসনে, ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের
আন্তর্জাতিক গবেষণা নেটেওয়ার্ক ও সহযোগিতা বসিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী অনুপাত মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর
অনুপাতকে নির্দেশ করে। কডিএস-এর বিশ্লেষণে এটি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক আকর্ষণ,
সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, পারস্পরিক যোগাযোগের সুযোগ, প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের বৈচিত্র্য এবং
শিক্ষার পরিশেষে আন্তর্জাতিকতার সঙ্কে সম্প্রকৃতি। অর্থাৎ একজন বাদিশি শিক্ষার্থী শুধু একটি
অতিরিক্ত শিক্ষার্থী নন; তিনি একটি ভিন্ন শিক্ষা-সংস্কৃতি, অভিজ্ঞতা, ভাষা, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি
এবং সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক যোগাযোগ নিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবশে করেন।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। আন্তর্জাতিকীকরণকে কেবল বাদিশি শিক্ষার্থীর
সংখ্যা দিয়ে বিচার করা যায় না। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক হাজার বাদিশি শিক্ষার্থী থাকলেও যদি
তাঁদের সঙ্কে কাজ করার মতো আন্তর্জাতিক শিক্ষক, আন্তর্জাতিক পাঠ্যক্রম, ইংরেজি মাধ্যমে
প্রচালিত উচ্চতর শিক্ষার কার্যক্রম, শিক্ষার্থী বনিময়, আন্তর্জাতিক গবেষণা সহযোগিতা এবং
সহায়ক ক্যাম্পাস পরিশেষে না থাকে, তাহলে সংখ্যাগত আন্তর্জাতিকীকরণ খুব বেশি অর্থহন নাও হতে
পারে। একইভাবে কয়েকজন বাদিশি শিক্ষক নিয়েও একটি বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক হয়ে
যায় না। প্রকৃত আন্তর্জাতিকীকরণ হলো এমন একটি পরিশেষে, যখন দেশি ও বাদিশি শিক্ষক-
শিক্ষার্থী একসঙ্কে শিক্ষা, গবেষণা, উদ্ভাবন এবং জ্ঞান বনিময়ে অংশগ্রহণ করেন। এ কারণেই
কডিএস-এর আন্তর্জাতিক শিক্ষক অনুপাত ও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী অনুপাতকে পাশাপাশি দেখা
জরুরি।

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় বৈপরীত্য এখানেই। দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দ্রুত
বড়েছে, শিক্ষার্থীর সংখ্যা বড়েছে, নতুন ক্যাম্পাস, বিভাগ ও শিক্ষাক্রম তৈরি হয়েছে; কিন্তু একই
অনুপাতে আন্তর্জাতিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বাড়েনি। বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি
কমিশনের ৪৮তম বার্ষিক প্রতিবেদনে ২০২২ সালের তথ্য অনুযায়ী সরকারি ও বেসরকারি

বিশ্ববদ্যালয়সমূহে মোট আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ২,২৮১ জন; এর মধ্যে সরকারি বিশ্ববদ্যালয়ে ৬৭৭ জন এবং বেসরকারি বিশ্ববদ্যালয়ে ১,৬০৪ জন। একই প্রতবিদেনে সংশ্লিষ্ট উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর মোট সংখ্যা ৪৪,৪১,৭১৭ জন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও এই বৃহত্তর সংখ্যার মধ্যে অধিকৃত ও অঙ্গীভূত কলেজ এবং মাদ্রাসাও অন্তর্ভুক্ত। এই পরিসংখ্যান বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার আন্তর্জাতিকীকরণের সীমাবদ্ধতা বোঝার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক সংকেত দেয়।

এই পরিস্থিতির তাৎপর্য আরও স্পষ্ট হয় যখন আমরা বাংলাদেশের বিশ্ববদ্যালয়গুলোর বর্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থানের দিকে তাকাই। কডিএস-এর বিশ্ববদ্যালয়-সংক্রান্ত প্রকাশিত সাম্প্রতিক তথ্য থেকে দেখা যায়, ঢাকা বিশ্ববদ্যালয়ে মোট ৪০,৩৩৬ শিক্ষার্থীর মধ্যে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ১৮২ জন এবং ২,১৬৪ শিক্ষকের মধ্যে আন্তর্জাতিক শিক্ষক প্রায় ১ শতাংশ; নর্থ সাউথ বিশ্ববদ্যালয়ে ১৬,০২৭ শিক্ষার্থীর মধ্যে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ৭৬ জন এবং ৯০২ শিক্ষকের মধ্যে আন্তর্জাতিক শিক্ষক ৬ শতাংশ; ড্যাফোর্ডলি ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববদ্যালয়ে ১৭,৩২১ শিক্ষার্থীর মধ্যে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ৫২৯ জন এবং ৮০৩ শিক্ষকের মধ্যে আন্তর্জাতিক শিক্ষক ৫ শতাংশ; আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনভার্সিটি-বাংলাদেশে ৯,২৮৪ শিক্ষার্থীর মধ্যে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ৮৯০ জন এবং ৫৬৪ শিক্ষকের মধ্যে আন্তর্জাতিক শিক্ষক ৪ শতাংশ। এগুলো বাংলাদেশের সব বিশ্ববদ্যালয়ে জাতীয় গড় নয়; বরং কডিএস-এর প্রকাশিত কয়েকটি বিশ্ববদ্যালয়ে তথ্য থেকে নেওয়া উদাহরণ। তবে এগুলো একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে-কিছু প্রতিষ্ঠানে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে দৃশ্যমান হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শিক্ষকের অংশ খুবই সীমিত।

এই তথ্য থেকে বাংলাদেশের বিশ্ববদ্যালয়গুলোর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত প্রশ্ন উঠে আসে। আমরা কিস্তিই বদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য একটি আকর্ষণীয় শিক্ষাকেন্দ্র তৈরির পরেছে? বিশ্বের উন্নত বিশ্ববদ্যালয়গুলো শুধু নিজের দেশের শিক্ষার্থীদের নিয়ে কাজ করে না; তারা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীকে তাদের শিক্ষাব্যবস্থার অবচ্ছদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করে। বদেশি শিক্ষার্থীর উপস্থিতি একটি বিশ্ববদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে বৈচিত্র্যময় করে, ভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে আলোচনায় নিয়ে আসে এবং শিক্ষার্থীদের তুলনামূলক বোঝাপড়া বৃদ্ধি করে। একটি বাংলাদেশি শিক্ষার্থী যখন একই শ্রেণিকক্ষে ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বা ইউরোপের শিক্ষার্থীর সঙ্গে কাজ করে, তখন তাঁর শিক্ষা শুধু পাঠ্যবইয়ের জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তা আন্তঃসাংস্কৃতিক শিক্ষা ও বৈশ্বিক নাগরিকত্বের দিকে এগিয়ে যায়।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক শিক্ষকের উপস্থিতির গুরুত্ব আরও গভীর। বদেশি একজন শিক্ষক বা গবেষক

কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলে তিনি শুধু একটি শিক্ষক পদ পূরণ করেন না; তিনি সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারেন নিজস্ব গবেষণা-সংযোগ, প্রকাশনার অভিজ্ঞতা, গবেষণাপদ্ধতিগত দক্ষতা, আন্তর্জাতিক অর্থায়নের যোগাযোগ এবং ভিন্ন একাডেমিক সংস্কৃতি কডিএসও আন্তর্জাতিক শিক্ষক অনুপাতকে আন্তর্জাতিক গবেষণা-নেটওয়ার্ক এবং প্রাতিষ্ঠানিক আকর্ষণের সঙ্গে যুক্ত করে। ফলে আন্তর্জাতিক শিক্ষক বৃদ্ধি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিকীকরণের পাশাপাশি গবেষণার উৎপাদনশীলতা ও একাডেমিক খ্যাতি উন্নয়নেও সহায়ক হতে পারে। এই জায়গায় পূর্ববর্তী লেখোগুলোর সঙ্গে বর্তমান আলোচনার একটি সুস্পষ্ট যোগসূত্র রয়েছে। একাডেমিক খ্যাতি উন্নত করতে হলে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়কে আগে আন্তর্জাতিক একাডেমিক সমাজে দৃশ্যমান হতে হবে। কিন্তু দৃশ্যমানতা শুধু গবেষণা প্রকাশনার মাধ্যমে তৈরি হয় না; গবেষক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক চলাচল, সহযোগিতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগও গুরুত্বপূর্ণ। একজন বাদিশি অধ্যাপক যদি কোনো বাংলাদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেন, তিনি তাঁর নিজস্ব দেশের সহকর্মীদের সঙ্গে যৌথ গবেষণা তৈরিকরতে পারেন। একজন বাদিশি গবেষক-শিক্ষার্থী বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়করে সঙ্গে গবেষণা করলে একটি দীর্ঘম্যোদ একাডেমিক যোগাযোগ তৈরি হতে পারে। একটি আন্তর্জাতিক শ্রণেকিক্স থেকে পরবর্তীতে যৌথ প্রকাশনা, সম্মেলন, শিক্ষার্থী বনিমিয় এবং যৌথ গবেষণা অনুদানের জন্ম হতে পারে। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক শিক্ষক অনুপাত এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী অনুপাত সরাসরি একাডেমিক খ্যাতির সূচক না হলেও এগুলো একাডেমিক খ্যাতি তৈরির পরবিশেকে শক্তিশালী করতে পারে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সমস্যাটি কেবল বাদিশি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কম-এতটুকু বললে বিশ্লষণ অসম্পূর্ণ থাকবে। মূল সমস্যা হলো বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখনো যথেষ্ট শক্তিশালী আন্তর্জাতিক আকর্ষণমূলক পরিচয় তৈরিকরতে পারেনি। একজন বাদিশি শিক্ষার্থী কনে বাংলাদেশে পড়তে আসবেন? একজন বাদিশি অধ্যাপক কনে তাঁর নিজ দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ছড়ে বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা বা গবেষণায় যুক্ত হবেন? এই দুটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের উচ্চশিক্ষার মান, গবেষণার অবকাঠামো, বৃত্তি, গবেষণার সুযোগ, নিরাপত্তা, আবাসন, ভসি সুবধি, ইংরেজি মাধ্যমে পরিচালিত শিক্ষাকর্ম, বৈশ্বিক স্বীকৃতি এবং শিক্ষা-পরবর্তী কর্মজীবনের সুযোগ-সবগুলো বিষয়কে একসঙ্গে বিচেনা করতে হবে। বাংলাদেশের রয়েছে কিছু অনন্য সুবধি। বৃহৎ তরুণ জনগোষ্ঠী, দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি, তৈরি পোশাকশলিপি, জলবায়ু ঝুঁকি, বদ্বীপ ব্যবস্থাপনা, জনস্বাস্থ্য, উন্নয়ন অধ্যয়ন, অভিবাসন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, খাদ্যনিরাপত্তা, কৃষি, ডিজিটাল রূপান্তর এবং সামাজিক উদ্ভাবনের মতো বহু বিষয় রয়েছে, যগুলো আন্তর্জাতিক গবেষণার জন্ম অতযন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশকে যদি শুধু একটি স্বল্পব্যয়ী শিক্ষাগন্তব্য হিসেবে নয়, বরং গবেষণাসমৃদ্ধ শিক্ষাগন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহলে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ও গবেষক আকর্ষণের সুযোগ অনেক বাড়তে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন, নদী ও বন্যা ব্যবস্থাপনা, নগরায়ণ, জনস্বাস্থ্য, দারিদ্র

হ্রাস, সামাজিক উন্নয়ন এবং জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের মতো বিষয়ে বাংলাদেশে নজিহে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাক্ষেত্র।

তবে এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নজিহে গবেষণা সক্ষমতা আন্তর্জাতিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়েবসাইটে শুধু ভর্তি বিজ্ঞপ্তি, একাডেমিক বরপত্র এবং প্রশাসনিক তথ্য থাকলেই হবে না। সেখানে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা তথ্যকেন্দ্র, শিক্ষাক্রমের বিস্তারিত বিবরণ, শিক্ষকদের পরিচিতি, গবেষণার সুযোগ-সুবিধা, বৃত্তির তথ্য, আবাসন ব্যবস্থা, ভিসা সহায়তা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক দপ্তর এবং পূর্ববর্তী আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। আজকের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় বছে নওয়ার

আগে অনলাইনে গবেষণা করেন। তাই ডিজিটাল দৃশ্যমানতা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী আকর্ষণের একটি মৌলিক পূর্বশর্ত। এখানে আবার একাডেমিক খ্যাতির সঙ্গে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি হয়। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে কারণ বিশ্ববিদ্যালয়টির সুনাম আছে; আবার আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক দৃশ্যমানতা বাড়ায়। একইভাবে বিদেশি শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন কারণ সেখানে গবেষণার পরিবেশ ও সুনাম আছে; আবার বিদেশি শিক্ষক নতুন গবেষণা-নটেওয়ারক তৈরি করে সেই সুনাম আরও বাড়াতে পারেন। ফলে আন্তর্জাতিকীকরণ একদিকে সুনামের ফল, অন্যদিকে সুনাম তৈরির কারণও। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এই পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝতে হবে।

বাংলাদেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত বৃদ্ধির সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জ কিছুটা ভিন্ন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলোর আন্তর্জাতিক একাডেমিক সুনাম, ঐতিহাসিক ঐতিহ্য এবং বিস্তৃত বিষয়ভিত্তিক পরিসর রয়েছে। বাংলাদেশের সরকারি উচ্চশিক্ষার একটি বৃহত্তর নীতিগত সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিকীকরণের জন্য বিশেষায়িত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক দপ্তর, অতিথি অধ্যাপক কর্মসূচি, প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক বতন কাঠামো, স্বল্পময়াদি গবেষণা বৃত্তি, আন্তর্জাতিক গবেষণোত্তর কর্মসূচি এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি চালু করা যতে পারে। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক সুবিধা, ভিসা সহায়তা এবং শিক্ষার সনদ ও পাঠ্যক্রমের পারস্পরিক স্বীকৃতি ও স্থানান্তর ব্যবস্থা উন্নত করা প্রয়োজন। বিদেশি শিক্ষার্থীকে আকর্ষণ করতে চাইলে ভর্তি প্রক্রিয়াও আন্তর্জাতিক মানের হতে হবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে আবার অন্য ধরনের সুযোগ রয়েছে। তাদের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ তুলনামূলকভাবে দ্রুত হতে পারে, ইংরেজি মাধ্যমে পরিচালিত শিক্ষাক্রম ইতোমধ্যে বিস্তৃত, এবং কিছু প্রতিষ্ঠানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিও তৈরি হয়েছে। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কডিএস তথ্য অনুযায়ী ১৬,০২৭

শিক্ষার্থীর মধ্যে ৭৬ জন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী এবং ৯০২ শিক্ষকের মধ্যে ৬ শতাংশ আন্তর্জাতিক শিক্ষক। ড্যাফোর্ডলি ইন্টারন্যাশনাল বশ্ববিদ্যালয়রে তথ্য অনুযায়ী ৫২৯ জন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী এবং ৫ শতাংশ আন্তর্জাতিক শিক্ষক রয়েছে। এই উদাহরণগুলো দেখায় যে বেসরকারি খাতে আন্তর্জাতিকীকরণে কতটা সম্ভাবনা ইতোমধ্যে তৈরি হয়েছে, যদিও তা আরও ব্যাপক ও গভীর করা প্রয়োজন।

তবে আন্তর্জাতিকীকরণে কতটুকু শুধু সংখ্যাগত লক্ষ্য নির্ধারণ করাও বণিজ্জনক হতে পারে। কোনো বিশ্ববিদ্যালয় যদি কডিএস-এর স্কোর বাড়ানোর জন্য অল্প সময়ে চুক্তিতে কয়েকজন বাদিশিক্ষক নিয়োগ করে, কিন্তু তাঁদের দীর্ঘম্যাদি গবেষণা-সম্পৃক্ততা না থাকে, তাহলে সেটি প্রকৃত আন্তর্জাতিকীকরণ হবে না। একইভাবে বাদিশিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়তে গিয়ে শিক্ষার মান কমিয়ে দেওয়া উচিত নয়। আন্তর্জাতিকীকরণে লক্ষ্য হওয়া উচিত মান, বৈচিত্র্য এবং একাডেমিক সমন্বয়-শুধু সংখ্যা নয়। এ কারণেই বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে “কতজন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী?” প্রশ্নের পাশাপাশি “আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়রে একাডেমিক পরিশেষে কী অবদান রাখছে?”-এই প্রশ্নটিও করতে হবে। এখানে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ভৌগোলিক বৈচিত্র্যও গুরুত্বপূর্ণ। কডিএস-এর বর্তমান পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর বৈচিত্র্যকে একটি পৃথক পরিমাপক হিসেবে বসিত আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততার আওতায় বিবেচনা করা হলেও বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয় র্যাংকিংয়ে এর ওজন বর্তমানে শূন্য শতাংশ; আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী অনুপাতের ওজন ৫ শতাংশ। অর্থাৎ বর্তমান প্রধান র্যাংকিংয়ে শুধু আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর অনুপাত সরাসরি স্কোরে প্রভাব ফেলে, কিন্তু কডিএস-এর বসিত পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর বৈচিত্র্যকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে।

বাংলাদেশে জন্য তাই লক্ষ্য হওয়া উচিত শুধু একটি বা দুটি প্রতিবিশী দশে শিক্ষার্থী আকর্ষণ করা নয়; বরং দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্য এশিয়া, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং অন্যান্য অঞ্চলরে শিক্ষার্থীদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা। বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যদি অঞ্চলভিত্তিক বৃত্তি, ইংরেজিতে পরিচালিত াতকোত্তর ও গবেষণাভিত্তিক উচ্চতর শিক্ষাক্রম এবং আন্তর্জাতিক গবেষণা বৃত্তি চালু করে, তাহলে বাদিশিক্ষার্থী আকর্ষণে সম্ভাবনা বাড়তে পারে।

বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আন্তর্জাতিকীকরণে কতটুকু আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিক্ষার ব্যয়। বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যদি মানসম্মত কিন্তু তুলনামূলকভাবে সাস্রয়ী শিক্ষা, গবেষণা ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের সমন্বয় করতে পারে, তাহলে এটি একটি প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা হতে পারে। তবে কম ব্যয় একই যথেষ্ট নয়। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী শিক্ষার মান, গবেষণার সুযোগ, সনদরে স্বীকৃতি এবং পড়াশোনা শেষে উচ্চশিক্ষা বা কর্মজীবনে সুযোগও বিবেচনা করেন। তাই “সস্তা শিক্ষা”

নয়, বরং প্রত্যয়োগ্যতামূলক ব্যয়ে উচ্চমানের শিক্ষা হওয়া উচিত বাংলাদেশে আন্তর্জাতিকি উচ্চশিক্ষা কৌশলের মূল বক্তব্য।

এক্ষত্রে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাম্প্রতিক অবস্থানও আশাব্যঞ্জক। ২০২৬ সালের মে মাসে ইউজিসি চ্যোরম্যান বলছেন যে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিশ্বের শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করা হচ্ছে। অর্থাৎ আন্তর্জাতিকি শিক্ষার্থী আকর্ষণ এখন শুধু পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয় নয়; এটি জাতীয় উচ্চশিক্ষা নীতিরও একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠছে। (বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন) কনিত্ত জাতীয় পর্যায়ে শুধু নীতগিত ঘোষণা যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন একটি জাতীয় উচ্চশিক্ষা আন্তর্জাতিকীকরণ কৌশল। এই কৌশলের আওতায় প্রত্যটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আন্তর্জাতিকীকরণ পরিকল্পনা থাকা উচিত এবং সটি পরমাপযোগ্য সূচকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা যতে পারে। যমেন-আন্তর্জাতিকি শিক্ষক অনুপাত, আন্তর্জাতিকি শিক্ষার্থী অনুপাত, কতটি দেশে থেকে শিক্ষার্থী এসছে, শিক্ষার্থী বনিমিয়, যৌথ প্রকাশনা, যৌথ তত্ত্বাবধান, আন্তর্জাতিকি গবেষণা অনুদান, অতিথি গবেষক, যৌথ শিক্ষাক্রম এবং আন্তর্জাতিকি প্রাক্তন শিক্ষার্থী নটেওয়ারক। এর ফলে আন্তর্জাতিকীকরণ একটি শ্লোগান না হয়ে প্রাত্যষ্ঠানিক কর্মদক্ষতার অংশ হবে।

একই সঙ্গে দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে বৈষম্যও বিচেনা করতে হবে। ১৭৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একই আন্তর্জাতিকীকরণ লক্ষ্য বাস্তবসম্মত নয়। গবেষণানিভর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য আন্তর্জাতিকি শিক্ষক, গবেষক-শিক্ষার্থী এবং আন্তর্জাতিকি গবেষণা সহযোগিতার লক্ষ্য বেশি হতে পারে। শিক্ষাদাননিভর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আন্তর্জাতিকি শিক্ষার্থী বনিমিয়, স্বল্পময়োদা শিক্ষাক্রম এবং যৌথ শিক্ষাদান বেশি গুরুত্ব পতে পারে। আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্থানীয় বাস্তবতা ও বিশেষায়িত গবেষণার ওপর ভিত্তি করে আন্তর্জাতিকি পরিচিতি তৈরি করতে পারে। অর্থাৎ সবার জন্য একই নীত নয়, বরং নিজস্ব লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্যভিত্তিক আন্তর্জাতিকীকরণ কৌশল প্রয়োজন।

বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আন্তর্জাতিকি শিক্ষক নিয়োগে ক্ষত্রে আরকেটি বাস্তবতা হলো মধোপাচার। বদিশে অবস্থানরত বাংলাদেশি শিক্ষাবিদদের একটি বড় অংশ আন্তর্জাতিকি একাডেমিকি নটেওয়ারক্রে সঙ্গে যুক্ত। তাঁদের সম্পূর্ণভাবে দেশে ফরিয়ি আনা সবসময় সম্ভব না হলেও অতিথি অধ্যাপক, খ-কালীন শিক্ষক, যৌথ তত্ত্বাবধায়ক, গবেষণা পরামর্শক এবং স্বল্পময়োদা গবেষণা বৃত্তির মাধ্যমে তাঁদের সঙ্গে প্রাত্যষ্ঠানিকি সম্পর্ক তৈরি করা সম্ভব। এটি তুলনামূলক কম ব্যয়ে আন্তর্জাতিকি একাডেমিকি নটেওয়ারক তৈরি একটি কার্যকর পথ হতে পারে। একইভাবে প্রবাসী শিক্ষাবিদদের মাধ্যমে বদিশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে গবেষণা সহযোগিতা তৈরি করা যতে পারে। আন্তর্জাতিকি শিক্ষার্থী আকর্ষণের ক্ষত্রেও প্রবাসী বাংলাদেশিদের নটেওয়ারক গুরুত্বপূর্ণ। বদিশে

বসবাসরত বাংলাদেশি প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও পশোজীবীদরে মাধ্যমে বাংলাদেশে বশ্ববদ্যালয়রে শিক্ষাক্রম আন্তর্জাতকভাবে পরচিতি করা যতে পারে। বশ্ববদ্যালয়রে প্রাক্তন শিক্ষার্থী সংগঠনগুলোকে শুধু পুনর্মলিনী বা সামাজকি যোগাযোগরে মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে আন্তর্জাতকি শিক্ষার্থী আকর্ষণ এবং প্রাতষ্টিানকি পরচিতি তরৈরি অংশ করা যতে পারে।

এখানে পূর্ববর্তী লখোয় আলোচতি গবষণার মানরে বিষয়টিও পুনরায় সামনে আসে। একজন বদিশেি অধ্যাপক কনে বাংলাদেশে আসবনে, যদি গবষণা অর্থায়ন সীমতি হয়? একজন বদিশেি গবষেক-শিক্ষার্থী কনে আসবনে, যদি গবষণাগার, গ্রন্থাগার, তথ্যভান্ডার, তত্ত্বাবধান এবং প্রকাশনার পরবিশে পর্যাপ্ত না হয়? ফলে আন্তর্জাতকীকরণ আসলে গবষণায় বনিয়োগরে বকিল্প নয়; বরং গবষণায় বনিয়োগরে স্বাভাবকি ফল। একইভাবে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত উন্নত না হলে আন্তর্জাতকি শিক্ষার্থী বাড়ালেও শিক্ষার অভিজ্ঞতা কষতগিরস্ত হতে পারে। তাই কডিএস-এর সূচকগুলোকে বচিছিন্নভাবে না দখে একটি পারস্পরকিভাবে সংযুক্ত ব্যবস্থা হিসেবে দখো প্রয়োজন। একাডমেকি খ্যাতি, শিক্ষকপ্রতি গবষণার উদ্ধৃতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত, আন্তর্জাতকি শিক্ষক অনুপাত এবং আন্তর্জাতকি শিক্ষার্থী অনুপাত-প্রতিটি একে অপরকে প্রভাবতি করতে পারে। কডিএস-এর বর্তমান পদ্ধতিতে গবষণা ও জ্ঞান আবষ্কার ৫০ শতাংশ, শিক্ষার অভিজ্ঞতা ১০ শতাংশ এবং আন্তর্জাতকি সম্পৃক্ততা ১৫ শতাংশ গুরুত্ব বহন করে; ফলে আন্তর্জাতকীকরণ একটি বৃহত্তর প্রাতষ্টিানকি মান কাঠামোর অংশ। বাংলাদেশে জন্য তাই সবচয়ে প্রয়োজন র্যাংকিংকেন্দ্রকি আন্তর্জাতকীকরণ নয়, বরং মানকেন্দ্রকি আন্তর্জাতকীকরণ। কডিএস র্যাংকিংয়ে স্কোর বাড়ানো একটি ফলাফল হতে পারে, কনিতু লক্ষ্য হওয়া উচতি এমন বশ্ববদ্যালয় গড়ে তোলা যখনে বদিশেি শিক্ষক কাজ করতে চান, বদিশেি শিক্ষার্থী পড়তে চান, আন্তর্জাতকি গবষেক সহযোগতি করতে চান এবং বাংলাদেশে শিক্ষার্থীরা নজিরে দশেই বশ্বকি একাডমেকি অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারনে। এই পরবির্তন ঘটলে কডিএস-এর স্কোর স্বাভাবকিভাবেই উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা তরৈি হবে।

সবশষে, বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার আন্তর্জাতকীকরণকে একটি দীর্ঘময়োদী জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে দখেতে হবে। আন্তর্জাতকি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত বৃদ্ধকিবেল কডিএস র্যাংকিংরে জন্য নয়; এটি বাংলাদেশে বশ্ববদ্যালয়গুলোকে বশ্বজ্ঞান ব্যবস্থার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত করার একটি কৌশল। বদিশেি শিক্ষক মাননে নতুন জ্ঞান ও গবষণা-নটেওয়ার্ক; বদিশেি শিক্ষার্থী মাননে নতুন সংস্কৃতি ও দৃষ্টিভিঙ্গা; আন্তর্জাতকি সহযোগতি মাননে নতুন গবষণার সুযোগ; আর এই সবকছির সমন্বতি ফল হলো একটি প্রাণবন্ত বশ্বকি বশ্ববদ্যালয় পরবিশে। বাংলাদেশে বশ্ববদ্যালয়গুলো যদি এই পরবিশে তরৈি করতে পারে, তাহলে দশে উচ্চশিক্ষা শুধু শিক্ষার্থী তরৈরি ব্যবস্থা হিসেবে নয়, বরং আন্তর্জাতকি জ্ঞান উৎপাদন ও বনিমিয়রে কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে। আগরে ধারাবাহকি লখোগুলোর আলোচনায় আমরা দখেছেি যে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন শুধু বশ্ববদ্যালয়রে সংখ্যা বৃদ্ধি, অবকাঠামো সম্প্রসারণ বা শিক্ষার্থী ভর্তি বাড়ানোর মাধ্যমে সম্ভব

নয়। শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত আমাদের শিখিয়েছে যে শিক্ষার মানের জন্য পর্যাপ্ত একাডেমিক মানবসম্পদ দরকার; একাডেমিক খ্যাতি আমাদের দেখিয়েছে যে বিশ্ব একাডেমিক সমাজে স্বীকৃতি অর্জনের জন্য গবেষণা ও দৃশ্যমানতা অপরিহার্য। এখন আন্তর্জাতিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত আমাদের সামনে আরও বসিত সত্যটি তুলে ধরছে-একটি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়কে একই সঙ্গে স্থানীয় ভিত্তি ও পর প্রতীতি এবং বৈশ্বিকভাবে সংযুক্ত হতে হয়। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভবিষ্যৎ প্রতিযোগিতা তাই শুধু ঢাকা, চট্টগ্রাম বা রাজশাহীর মধ্যে নয়; বরং সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ভারত, চীন, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং বিশ্বের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে।

সুতরাং বাংলাদেশের প্রায় ১৭৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আগামী দিনের লক্ষ্য হওয়া উচিত সংখ্যাগত সম্প্রসারণ থেকে গুণগত আন্তর্জাতিকীকরণের দিকে যাত্রা। এই যাত্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়কে তার নিজস্ব শক্তি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক একাডেমিক বিশেষত্ব তৈরিকরতে হবে। কোথাও জলবায়ু গবেষণা, কোথাও জনস্বাস্থ্য, কোথাও প্রকৌশল, কোথাও ব্যবসা, কোথাও উন্নয়ন অধ্যয়ন, কোথাও সমাজবিজ্ঞান, কোথাও কৃষি বা ডিজিটাল উদ্ভাবন-যে ক্ষেত্রেই শক্তি রয়েছে, সেটিকে আন্তর্জাতিকভাবে দৃশ্যমান করতে হবে। তার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে আন্তর্জাতিক শিক্ষক, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী, যৌথ গবেষণা, শিক্ষার্থী বিনিময় এবং বৈশ্বিক একাডেমিক অংশীদারত্ব। যদি বাংলাদেশ এই পথ অনুসরণ করতে পারে, তবে আন্তর্জাতিক শিক্ষক অনুপাত ও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী অনুপাত শুধু কডিএস-এর দুটি সূচক হিসেবে থাকবে না; এগুলো বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার রূপান্তরে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপক হয়ে উঠবে। তখন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীকে আমরা আর কেবল “বিশেষ শিক্ষার্থী” হিসেবে দেখে না; বরং তাঁকে দেখে জ্ঞান ও সংস্কৃতি দূত হিসেবে। বিশেষ শিক্ষককে দেখে শুধু শিক্ষক হিসেবে নয়; বরং আন্তর্জাতিক গবেষণা-নেটেওয়ার্কের একটি সত্তা হিসেবে। আর আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগিতাকে দেখে আনুষ্ঠানিক সমঝোতা স্মারকের সংখ্যা হিসেবে নয়; বরং যৌথ জ্ঞান উৎপাদনের বাস্তব অবকাঠামো হিসেবে।

শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার আন্তর্জাতিক মর্যাদা অর্জনের প্রশ্নটি কডিএস র‍্যাংকিংয়ের একটি স্কোরের চেয়ে অনেক বড়। এটি বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিশ্বকে কী দিতে পারে এবং বিশ্ব থেকে কী শিখতে পারে-তার প্রশ্ন। একটি বিশ্ববিদ্যালয় তখনই প্রকৃত অর্থে আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠে, যখন তার ক্যাম্পাসে ভিন্ন দেশের মানুষ জ্ঞান বিনিময় করে, তার গবেষণা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে আলোচিত হয়, তার শিক্ষকরা আন্তর্জাতিক একাডেমিক নেটেওয়ার্কের অংশ হন এবং তার শিক্ষার্থীরা দেশীয় শপিংয়ে ওপর দাঁড়িয়ে বৈশ্বিক নাগরিক হিসেবে প্রস্তুত হয়। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার পরবর্তী অগ্রযাত্রা তাই শুধু আরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয় নয়, বরং আরও বেশি বৈশ্বিকভাবে সংযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার দিকে হওয়া উচিত। আর এই রূপান্তরই একদিন একাডেমিক খ্যাতি, গবেষণার প্রভাব, আন্তর্জাতিকীকরণ এবং সামগ্রিক কডিএস ফলাফল-সবকছুকে একই সঙ্গে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যতে

